নক্ষত্রে সাজানো ডানা

কালীকৃষ্ণ গুহ

উৎপলকুমার বসুর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চৈত্রে রচিত কবিতা' ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয়, যার রচনাকাল ১৯৫৬-১৯৬১। অর্থাৎ তাঁর ১৯ বছর বয়সের কবিতাও এই বইতে স্থান পেয়েছে। এই বইতেই উৎপলকুমারের আশ্চর্য মৌলিক আবির্ভাব ঘটল আগের দশকের লিরিক-শোভিত বাংলাকবিতার সরল ও নম্র পরিবেশে। তিনি লিখলেন :

দয়িতা, তোমার প্রেম আমাদের সাক্ষ্য মানে নাকি ?
সূর্য-ডোবা শেষ হল কেননা সূর্যের যাত্রা বহুদূর।
নক্ষত্র-ফোটার আগে আমি একা মৃত্তিকার পরিত্যক্ত, বাকি—
আঙুরের ফলের ঘ্রাণ, গম, যব, তরল মধুর
রৌদ্র সমুজ্জ্বল স্নান শেষ করি।

('চৈত্রে রচিত কবিতা'র ভূমিকার অংশ)

তাঁর প্রস্তুতিপর্বের কিছুই আমাদের চোখে পড়ল না। একটিও কাঁচা কবিতা লিখলেন না তিনি। তাঁর উৎস দেখতে পেল না বাংলাকবিতার চিন্তিত ও ধুরন্ধর

পাঠক। 'সূর্য-ডোবা শেষ হল কেননা সূর্যের যাত্রা বহুদূর' এই জাতীয় দার্শনিকোচিত বাক্যের পরিচ্ছন্ন অর্থ ও যুক্তি উদ্ধার করা গেল না। ফলে বাংলা কবিতার পাঠক একই সঙ্গে অভিভূত ও বিমূঢ় বোধ করল। আজ প্রায় চার দশক পরেও উৎপলের কবিতা নিয়ে কবিতাপাঠকের ভাবনা ও মুগ্ধতাবোধ অন্তহীন। মাত্র এক বছর আগেই বাংলা কবিতার একজন মনোযোগী পাঠক এবং অনতিতরুণ কবি লিখেছেন, 'সত্যি কথা বলতে কি, উৎপলকুমার বসুকে আমার বরাবরই এক বিদেশী কবি বলে মনে হয়েছে। বাঙালি কবি হিসেবে আমি তাঁকে কোনোদিন ভাবতে পারিনি। তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে কেবলই মনে হয়েছে এ যেন কোনো বিদেশী কবির অসাধারণ বাংলা অনুবাদ।' এরকম মনে-হওয়ার প্রধান কারণ হিসেবে তিনি উৎপলকুমারের কিছু কবিতার শিরোনাম এবং পঙক্তি নির্দেশ করেছেন, যেমন, 'যীশুর বাড়ির হাঁস' 'পোপের সমাধি' এবং, যেমন, 'নিরক্ষর বেশ্যাদের চিঠিগুলি লিখে দিচ্ছি এই ফাঁকা তেষট্টিতে, মরিয়ম তোমার বাগানে', 'তোমাদের কার্পাস বাগানে ঈশ্বরপ্রদত্ত গাধা চরছে একাই' ইত্যাদি। কিন্তু তাঁকে 'বিদেশী কবি' বলে মনে হওয়ার কারণ শুধু সামান্য কিছু কবিতায় বিদেশী পুরাণের অনুষঙ্গ নয় বলেই আমার ধারণা। তাঁকে 'বিদেশী কবি' বলে মনে হওয়ার প্রধান কারণ, আমার মনে হয়, তাঁর মৌলিক ভাষাবিন্যাস, মনোভঙ্গি, কল্পনার পরাবাস্তব বিস্তার, অবচেতনের আশ্চর্য। উদ্ভাস— এবং, সবকিছু মিলিয়ে, যে অচেনা **পাঠ** তৈরি করে দিয়েছেন তিনি তা-ই। তাছাড়া, তিনি কবিতায় অত্যন্ত সফলভাবে আত্মগোপন করতে পেরেছেন। ব্যক্তিগত স্তরের দুঃখ-বেদনা-প্রেম-ব্যাকুলতার প্রকাশ তাঁর কবিতায় কদাচিৎ ঘটেছে। কবিতায় তাঁর ভূমিকা একজন উদাসীন, দূরত্বসঞ্চারী, স্বগতোক্তিময় নিরপেক্ষ দর্শকের। এই ভূমিকা বাঙালি কবির কোনোদিন ছিল না কেননা, কালচেতনায় আক্রান্ত এবং প্রজ্ঞা-প্ররোচিত বাঙালি কবি প্রধানত নিজের দুঃখবেদনার কথাই গভীর হৃদয়াবেগে প্রকাশ করতে চেয়েছে। এই অর্থে উৎপল একজন 'বিদেশী' কবি।

২

উৎপলের কবিতার প্রথমপর্ব শেষ হয়ে যায় ১৯৬৪ সালে— 'পুরী সিরিজ' প্রকাশিত হওয়ার পরেই— মাত্র ২৭ বছর বয়সে। একটি কবিতা-লেখার 'অপরাধে' এক মহিলা-কলেজের এই তরুণ অধ্যাপককে বিচার করা হয়, এবং সেই বিচারের শাস্তি হিসেবে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে বলা হয় তাঁকে; তিনি তা না-করে, কিছুদিন নির্বাক থেকে, ইয়োরোপ চলে যান— কেন যাচ্ছেন তা না-জেনেই, সম্পূর্ণ লক্ষ্যহীনতায়— শুধু আত্মসম্মান বাঁচানোর প্রাথমিক এবং আস্তিত্বিক প্রয়োজনে। আত্মসম্মান বাঁচানোর এতটা জরুরি প্রয়োজন ক'জন বাঙালি কবি কল্পনা করতে পারেন? তাঁরা জানেন বারংবার অপমানিত হওয়াই তাঁদের নিয়তি। জেনে, তাঁরা অপমানিতের কবিতা লিখে পরিশুদ্ধ হতে চান। উৎপল বেছে নিলেন অন্যরকম ভাগ্যপরীক্ষা। 'পুরী সিরিজ'

বইটির প্রকাশকের— হয়তো লেখকেরও— দাবি ছিল 'এতে সমুদ্র, বামন, তাঁতকল, শিকারী, সতী, নপুংসক, মিসিবাবা, এয়ারোড্রোম সূচ ও আত্মা, রণরক্ত ও সন্ধ্যাবাতাস, কৈবল্য ও ঈশ্বরোপসনার কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পাঠকের ব্যক্তিগত আনন্দের জন্য এক নিষিদ্ধ পারমাণবিক চুল্লী খুলে দেখানো হল এই গ্রন্থে।' এখানে, এই গ্রন্থে 'নিষিদ্ধ পারমাণবিক চুল্লীটি দেখে বাংলা কবিতার নিদ্রাহীন বা স্বপ্নোত্থিত পাঠক যেমন আনন্দ পেয়েছে তেমনি নিঃসন্দেহে বলা যায়, সে অনেকটাই বিমূঢ় বোধ করেছে। বাংলাকবিতার এতদিনের চেনা লিরিকসর্বস্বতা, আবেগময়তা, আত্মকেন্দ্রিক বোধের কাঠামো, যুক্তিবাদিতার পরিসীমা, নৈতিকতা, সমাজমনস্কতা, এবং সর্বগ্রাসী জীবনানন্দীয় বিষাদ কোথায় এখানে? এই প্রশ্ন থেকে বিমূঢ়তার জন্ম। উৎপল, দেখা যাচ্ছে, প্রায় একজন টিন-এজার হিসেবেই বাংলা কবিতায় তাঁর মৌলিক স্বর জুড়ে দিতে শুরু করেন— ৫৬ সাল থেকে— এবং এই সৃষ্টিশীলতার প্রথমপর্ব শেষ হয় ৬৪-তে, যখন ৬৪-তে, তিনি তাঁর অপূর্ব ও ব্যক্তিগত লিখনভঙ্গিমা হারিয়ে ফেলেন এক মানসভ্রমণ শেষে, যেমন বলা হয়েছে তারই আলঙ্কারিক স্বীকারোক্তিতে, যা এই: 'আমার ব্যক্তিগত লিখনভঙ্গিমা আমি হারিয়েছি বাদাম পাহাড়ে।' এই পর্বে উৎপল ছন্দোহীন কিছুই প্রায় লেখেননি, এবং এইটুকুই শুধু তাঁর ঐতিহ্য অনুসরণ। এমনকি স্বরবৃত্তেও লিখেছেন তিনি, যেমন :

মন মানে না বৃষ্টি হলো এতো
সমস্ত রাত ডুবো নদীর পাড়ে
আমি তোমার স্বপ্নে-পাওয়া আঙুল
স্পর্শ করি জলের অধিকারে

('চৈত্রে রচিত কবিতা'র ৮ নং কবিতার অংশ)

কিন্তু স্বরবৃত্ত-মাত্রাবৃত্তের আরামের গণ্ডিবদ্ধতায় থাকতে চাননি তিনি— এতখানি পারদর্শিতা সত্ত্বেও। গিয়েছেন অক্ষরবৃত্তের সম্প্রসারণে যেখানে তাঁর বিমূর্ততার চর্চা দিগন্ত স্পর্শ করে। উপায়হীনভাবেই কয়েকটি উদাহরণ রাখতে হবে যেহেতু কারো কবিতার স্বরূপ বোঝাতে হলে দরকার সেই কবিতাগুলিই, বা, অন্তত, তার কিছু অংশ।

১. বকুল তোমাকে শুধু ঈর্ষা করি, কতো না সহজে
তুমি তার মস্তকেশে ডুবে যাও অনির্বাণ
তোমার ভিতরে নেই প্রবচন, ছায়া, শান্তি, গ্রহের বীজাণু
আমার অনন্ত রক্ত ঝরে যায় অগ্নির সমাজে—

২. বালির নির্জন বুকে পড়ে-থাকা নৌকোগুলি তোমাদের জানে—
তাদের ছায়ায় বসে গান করো সারাদিন হৃদয়পণ্যের

কখনো নেমেছো ঢেউ-য়ে, নীলিমায়, স্নানে
উঠেছে শীর্ণ ধোঁয়া তোমাদের দারিদ্র-অন্নের—

৩. উটের ঘণ্টার শব্দে, দিগন্তের অদ্ভুত সম্বলে
তারা যায়— জলের কিনার ঘেঁসে পুব থেকে পুবে
আমার চোখের 'পরে পৌরুষের নারীত্বের মহান কৌশলে
জেগে ওঠে সেই জাল ক্লান্তিহীন, অবলম্বহীন।

৪. তবুও ঝড়ের শেষে, তবুও দিনের শেষ, অন্ধকার বনে
বৃষ্টির মেঘের তলে শোনা গেল আর্ত কেকারব
বুঝি নির্জনতা পেয়ে পুনর্বার মেলেছে বিশাল
নক্ষত্রে সাজানো ডানা। পেয়েছ নির্দেশ ?

৫. কেবল পাতার শব্দে আমি কাল জেগেছি সন্ত্রাসে।
ভেবেছি সমস্ত দিন এত লেখা, এত প্রশ্ন, এ-কথা—
তারও পিছে কোটি কোটি চিহ্ন— তীর শস্যের শিখরে
উঠেছে চাষের গান, স্বপ্নে দেখা মায়ের মতন।

৬. উপনয়নের তুলো উড়ছে বাতাসে
তাজমহলের সিঁড়ির কিনার দিয়ে গর্ভবতীদের আমি ক্রমাগত
উঁচু বারান্দার দিকে উঠে যেতে দেখি—

৭. পুরনো জামের বনে আমি শুধু মানুষের
শোভাযাত্রা দেখেছি শৈশবে।

৮. অনেক মলিন আছি
সারাদিন— ঢাকা আছি পরচুলাময়
আতঙ্কজনক লোমে— দু'পায়ের ফাঁকে

৯. আমি কান পেতে শুনেছি কোলাহল, শোভাযাত্রার দৈববাণী
স্ত্রীলোকের রক্তক্ষরণ হচ্ছে এই মহাউৎসবের দিনে।

উদ্ধৃতিগুলির প্রথম ৪টি 'চৈত্রে রচিত কবিতা' থেকে নেয়া। পরের ৬টি 'পুরী সিরিজ'-

এর বিভিন্ন কবিতার অংশ। এখন, কথা এই যে এতগুলি উদাহরণ দিয়ে আমি কি সত্যিই কিছু বোঝাতে পারছি ? এই প্রশ্নটি সর্বতোভাবে নিজের প্রতি। আমি নিজেই কি বুঝেছি উৎপলকুমার বসুর কবিতা ? এ প্রশ্নটি নিজের প্রতি। উত্তরে বলি না, গোল করে বুঝিনি, তবে অগণিত সংকেত এবং শিহরণ পেয়েছি। অনেক কবিতা-পড়া হয়ে গেছে আমাদের। অনেক কবির কবিতা-পড়া— অনেকবার পড়ার পড়েও— বাকি আছে। যেসব কবির কবিতা-পড়া বাকি আছে এখনো উৎপলকুমার বসু তাঁদের একজন। তাঁর কবিতার বিভিন্ন বাক্যের বা প্রস্তাবের অ্যাবসার্ড সাজুয্য, তাঁর রচনার অনুভূতি-স্থাপিত বিমূর্ততা, তাঁর অবচেতন-উৎসারিত সংকেতগুলি বারবার তাঁর কবিতা পড়ে দেখতে প্ররোচিত করে। পুরনো জামের বনে আমি শুধু মানুষের শোভাযাত্রা দেখেছি শৈশবে বা স্ত্রীলোকের রক্তক্ষরণ হচ্ছে এই মহাউৎসবের দিনে বা আমার সমস্ত রক্ত ঝরে যায় অগ্নির সমাজে— এই জাতীয় অজস্র অ-লৌকিক প্রস্তাবের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মনোবিজ্ঞানীদের কাজ, যা তাঁরা হয়তো সত্যিই কোনোদিন করবেন। আমরা শুধু এইসব সংকেতগুলির বা বিমূর্ততাগুলিকে নিজের মতো করে চিনে নিতে পারি। এইসব চিনে-নেয়াতেই আপাতত আমার মতো অন্যমনস্ক পাঠকের কবিতা-পাঠের সার্থকতা।

৩

ন'বছর জুড়ে কাব্যচর্চার প্রথমপর্বের পর এক যুগ ইয়োরোপ-প্রবাসীর নিরক্ষর জীবন কাটিয়ে উৎপল ফিরে এলেন ১৯৭৮ সালে। ফিরে এসেও কিছুদিন নির্বাক থেকে একদিন সুরেন ব্যানার্জি রোডে নির্জনতার সঙ্গে দেখা হল তাঁর। একটি চিরুনি কিনে তাতে দেখতে পেলেন স্ত্রীলোকের চুল লেগে আছে। এই হল সেই নির্জনতা যা তাঁকে আবার কবিতা লিখতে প্ররোচিত করল। প্রকাশিত হল 'লোচনদাস কারিগর' এবং, আরো পরে, 'খণ্ড বৈচিত্রের দিন'। তাঁর দ্বিতীয়-পর্বের কবিতা প্রথম-পর্বের তুলনায় স্বভাবতই বেশি মেধানির্ভর, যেখানে অবচেতনও অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত। প্রথম-পর্বের ট্রান্স বা উন্মাদনা এখানে না থাকলেও এখানে তিনি মিশ্রণ ঘটিয়েছেন অধীত পরাবাস্তবতার সঙ্গে সচেতন ভাবনার, জুড়ে দিয়েছেন কিছু স্মৃতির আলোড়ন। তাছাড়া, তাঁর আশ্চর্য পর্যবেক্ষণগুলিও রয়ে গেছে এখানে, ফলে তিনি দেখেন। মাঠ পেরিয়ে গ্রাম পেরিয়ে বৌভাত খেতে চলেছে এক নির্বান্ধব গ্রাম্য হাবা কিশোর। আর তার ওই উচ্চাকাঙ্ক্ষী যাওয়াটুকুই সব। কিন্তু বাংলা কবিতার লিরিক-ঐতিহ্যের নিশ্চয়তায় ফিরলেন না তিনি। তিনি রয়ে গেলেন একজন 'বিদেশী', অর্থাৎ নন-কনফরমিস্ট, কবিতালেখার বদলে যাঁর কোনো-কিছু পাওয়ার দরকার হয়নি— অর্থ, খ্যাতি, পুরস্কার, অমরতা (যা অবশ্যই ২০/৩০/৫০ বছরের), সভার হাততালি বা কবিসম্মেলনের সভাপতিত্ব। প্রতিষ্ঠান থেকে সচেতন দূরত্বে থাকলেও তাঁর ধ্যানধারণা আত্মতৃপ্তিময় ক্ষুদ্রবুদ্ধি লেখকদের শান্তি নষ্ট করে। তিনি আনরিজিনের অনুসন্ধানে আজো খুঁড়ে

চলেছেন জ্ঞানের জগৎ— যে অবস্থান থেকে অভিভূত ও কম্পমান ঈশ্বরবিশ্বাসী এবং ভঙ্গুর নাস্তিকের প্রতি একই সঙ্গে অসম্মতিসূচক হেসে-ওঠা যায়— যেভাবে হেসে ওঠেন তিনি।

লক্ষ করি, তিনি অনুসন্ধান করে চলেছেন সংগীতের সারবত্তা, মনোজগতের কিছু-কিছু অন্ধকারাচ্ছন্ন সিঁড়ি, সেইসঙ্গে হয়তো অতীতহীন কোনো ঠিকাদারের সঙ্গ। কবি অনুসন্ধান করে চলেছেন আগন্তুক কোনো নবীন কবির বিরল কাব্যভাষা, অদীক্ষিত কোনো চিত্রশিল্পীর নিজস্ব কিছু রেখা ও রঙ। তিনি অনুসন্ধান করে চলেছেন সেই ঈশ্বর-অনুষঙ্গহীন আশ্রমের যেখানে কোনো বাক্য উচ্চারিত হবে না। তিনি অনুসন্ধান করেন সেইসব মানবসম্পর্কের, শৈশবস্মৃতি যা একজন প্রৌঢ়ের ভোরবেলার স্বপ্নে প্রতিফলিত হয়— বয়ে আনে নশ্বরতার সংকেত।

৪

আজ যদি কেউ প্রশ্ন করে : উৎপলকুমার বসুর কি সেই টরমেন্টেশন ছিল যা সারাজীবন একজন কবিকে আস্তিত্বিক প্রশ্নে আলোড়িত রাখে— যার প্রভাব ঘটে সুদূরপ্রসারী ও কালজয়ী কবিতায়, যেখানে ভাষাব্যবহারও তুচ্ছ? বলব, সূর্য-ডোবা শেষ হল কেননা, সূর্যের যাত্রা বহুদূর। অর্থাৎ, এই প্রশ্নের উত্তর দেবার আমরা কেউ নই। আমরা কবি উৎপলকুমার বসুর প্রতি মুগ্ধতা কাটিয়ে-ওঠার আগেই পাণ্ডিত্যবিরোধী উৎপলকুমারের সঙ্গে কিছু মেলামেশা করে বুঝেছি যে তিনি স্বয়ং একটি পতিত বিশ্ববিদ্যালয় যার টিনের বেড়ার গায়ে আলকাতরা দিয়ে লেখা আছে এই কথাগুলি : স্বপ্ন এবং সত্য দুই-ই বাস্তব। □